মাধবী মুখার্জী

তোর কি যে কসম খাই, চোখের কোণে পানি আসছে ভাই

পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় যখন 'বাইশে শ্রাবণ' ছবি করছিলাম সেই সময়। দুর থেকে দেখেছিলাম। একটু কবি-কবি চেহারা। তখনকার দিনের কবিদের যে কনসেপ্‌শন ছিল, সেরকম চেহারার মানুষ। ঝাঁকড়া চুল ছিল। কিন্তু কোথায় একটা অসম্ভব গাম্ভীর্যও ছিল। মাঝে মাঝে স্টুডিওতে আসতেন। পরে শুনলাম উনি পাবলিসিটিতে কাজ করছেন। এটুকুই ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

পরবর্তীকালে পূর্ণেন্দুবাবু একটা ছবি করলেন, যার নাম 'স্বপ্ন নিয়ে'। সেই সময় উনি আমার কাছে এলেন; এবং বললেন, "মাধবী, এই চরিত্রটা আপনিই করবেন।" স্ক্রিপ্টের কিছু শোনালেন। বললেন, "বাকিটা পরে আপনাকে শোনাব।"

শ্যুটিং করতে যাওয়ার কিছুদিন আগে হঠাৎ পূর্ণেন্দুবাবু আমার কাছে এলেন। এসে বললেন, "আমি ভীষণ সমস্যায় পড়েছি, আপনি কি করবেন বলুন।" আমি বললাম, "আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারছি না। আমি কি করব মানে?" উনি বললেন, "আমি যাকে ক্যামেরাম্যান নিয়েছিলাম (যদ্দুর মনে হচ্ছে সৌমেন্দু রায়) তিনি এবং আরো কয়েকজন, —তারা কেউ আমার কাজ করবে না। সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, আপনিও করবেন না?" আমি বললাম, "সেটার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাঁরা কেন করবেন না, তা আমি তো জানি না। আমার তো না করার কোন কারণ নেই।" তখন উনি বললেন, "থ্যাঙ্ক য়ু, মাধবী। আমি আজ উঠি।" এই বলেই চলে গেলেন। উনি চা-ও খেলেন না।

তারপর বেশ কিছুদিন পরে আমাদের শ্যুটিং শুরু হল। অনেকটা শ্যুটিং করলাম। কিন্তু কিছুদিন পর ছবিটা বন্ধ হয়ে গেল। এখানে একটা কথা বলব, যেটা আমার অদ্ভুত মনে হয়েছে, যে, উনি যেসব দৃশ্য ভাবতেন, যে দৃশ্যে আমি নেই তেমন দৃশ্যেরও কথা আমাকে এসে বলতেন। বলতেন, "মাধবী, আমি এই রকম ভেবেছি। স্বপ্নের একটা দৃশ্য। দৃশ্যটা আমি এভাবে করব ভেবেছি, কিরকম লাগবে বলুন তো।" এসব যে উনি কেন আমাকে বলতেন জানি না। আমার যেটুকু মনে হত, বোধ হত, আমি সেই বোধবুদ্ধিমত পূর্ণেন্দুবাবুকে বলতাম, যে, "এটা খুব ভাল লাগবে।" কখনো "এটা কি ঠিক ভাল লাগবে?" আমার যা মনে হত, তাই বলতাম। হয়ত আমি একটা সহজ-সরল মেয়ে ভেবেই আমাকে তিনি এসব বলতেন।

হঠাৎ আবার একদিন এলেন, এসে বললেন, "মাধবী, ছবিটা করতে পারছি না। আর টাকাপয়সা নেই, শেষ হয়ে গেছে।" আমি কি আর বলি, বললাম, "টাকা পয়সা তো আমারও নেই যে বলব, আমি পয়সা দিচ্ছি ছবি করুন—এরকম ক্ষমতাও আমার নেই। আমি দুঃখিত যে, কিছু করার নেই।"

আবার কিছুদিন গেল। আমাকে তো কাজ করতেই হয়। তো কাজ করছি, করছি, তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন পূর্ণেন্দুবাবু এসে হাজির। খুবই গম্ভীরভাবে, বললেন, "দেখুন মাধবী, আমি ছবিটা করতে পারি। তবে যদি ছবি করি তাহলে আপনাকে পয়সা দিতে পারব না, আর যদি আপনি পয়সা নেন, তাহলে ছবি করতে পারব না। আমি কি করব আপনি স্থির করুন।" তখন আমি বললাম, "আপনি ছবিই করুন। আমাকে পয়সা দিতে হবে না।" এবারে পূর্ণেন্দুবাবুর ভুরু কোঁচকানো বন্ধ হল। একবার আমার স্টিল দেখে উনি বলেছিলেন, মন্তব্য করেছিলেন, "মেয়েটার ঐ ভুরু কোঁচকানোটা আমার একদম ভাল লাগত না।" সেদিন বললাম, "কোন চরিত্রে, কোন সিচুয়েশনে কোঁচাকাচ্ছি সেটাও তো ভাবতে হবে। আপনিও আজকে কতটা ভুরু কোঁচকালেন বলুন তো।"

যাইহোক শ্যুটিং শুরু হল। পূর্ণেন্দুবাবু ডেট দিতে বললেন। কিন্তু আমি পড়লাম মুশকিলে। সবাই ডেট নিয়ে নিয়েছে। আর কোনো ডেট নেই। কথাটা ওঁকে বলতে উনি বললেন, "আমাকে তো সাহায্য করতেই হবে মাধবী। সবাই আমাকে সাহায্য করছেন, আপনিও করছেন।"

এখানে একটা কথা বলতেই হবে যে, 'অরোরা'র অজিতবাবুর কথা। অজিতবাবু ভীষণ ভালো মানুষ ছিলেন। উনি বুঝতে পারতেন কার মধ্যে কতটা ক্ষমতা। এইসব মানুষগুলো চলে গিয়ে আমাদের অনেক অসুবিধে হয়েছে। উনি তখন পূর্ণেন্দুবাবুকে বলেছেন যে, "ঠিক আছে, তুমি আরোরাতে শ্যুটিং কর, আমি তোমাকে সবরকমভাবে সাহায্য করব।" তো আমি পূর্ণেন্দুবাবুকে বললাম, "কি হবে, ডেট তো একটাও নেই।" উনি বললেন, "তা তো আমি জানি না আপনাকে ডেট বার করতেই হবে।" আমি তখন বললাম, "আপনি একটা কাজ করতে পারেন, আমার তো সকাল থেকে শ্যুটিং আছে, (তখন 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' হচ্ছিল। পরিচালক ছিলেন জগন্নাথ চ্যাটার্জী কিন্তু জগন্নাথবাবুর কাজ ভাল না হওয়াতে বিশ্বজিৎ গিয়ে হৃষিকেশ মুখার্জীকে নিয়ে এলেন। ভোর চারটের সময় চলে যেতাম দক্ষিণেশ্বরে। ওখানে শ্যুটিং হত। কখনো বালী ব্রিজের উপরে, কখনো দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে। ফিরতে প্রায় দুটো বেজে যেত।) আপনি ছটা থেকে বারটা পর্যন্ত করুন।" শুনে উনি তাতে রাজী হলেন। কিন্তু শ্যুটিং করার সময় যা হয়, অবশ্য সবারই এটা হয়, পুণেন্দুবাবুরও তাই হয়েছিল। কাজ হচ্ছে তো হচ্ছে, ওঁর কোন খেয়ালই নেই যে, বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে, রাত হয়ে যাচ্ছে, মাধবী কি করে বাড়ি ফিরবে। মাধবী যে ডবল শিফ্‌ট করছে। এবং রাত বারটা তো বাজলই, একটা বাজল, দুটো বাজল ওঁর খেয়ালই নেই। আমিও ওঁকে ডিসটার্ব করতাম না। যখন কাজ হয়ে যেত আমি বলতাম,

"পূর্ণেন্দুবাবু সকালে উঠে আমি আর কাজে যেতে পারি না। আমার চোখটা খোলে না।" পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, "সত্যিই তো চোখটারও একটু বিশ্রাম দরকার। সত্যিই এটা খুব অন্যায় হয়েছে। ঠিক আছে কাল থেকে আমি ঠিক বারটায় প্যাকআপ করে দেব।"

কিন্তু পরের দিনও একই ঘটনা ঘটল। প্রায় পৌনে তিনটে বাজল। তখন আমার মেকআপম্যান বলল, "দিদি, আপনি মুখে ক্রীম মেখে বেরন, তাহলে আর বলবে না।" আমি তখন বললাম, "না, এটা কি ঠিক হবে, আমি একজন ডিরেকটারকে অপমান করতে পারি না।" উনি তখন বললেন, "তাহলে আপনি এক কাজ করুন, ক্রীমটা হাতে করে নিয়ে যান।" আমি তখন ক্রীমটা নিয়ে গিয়ে পূণেন্দুবাবুকে বললাম, "পূর্ণেন্দুবাবু এই দেখুন ক্রীম।" কিন্তু উনি সেই সময় কাজের মধ্যে এতটাই বিভোর যে বুঝতেই পারছেন না, ওটা ক্রীম। আমি তখন আবার বললাম, "এই দেখুন ক্রীম, দেখতে পাচ্ছেন, আমি কিন্তু এটা মুখে মাখতে পারি। আমি কি এটা মুখে মাখব?" তখন ওঁর সেন্সটা হল। তখন উনি বললেন, "হ্যাঁ, আপনি এটা মুখে মাখুন।" তখন প্রায় রাত তিনটে বাজে।

ওদিকে 'স্বপ্ন নিয়ে'-র ক্যামেরাম্যান যখন কাজটা রিফ্যুজ করলেন, তখন এ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন কেষ্টদা, অর্থাৎ কৃষ্ণ চক্রবর্তী। পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, আমি ওকেই নেব, এবং নিলেন। এটাও পূর্ণেন্দুবাবুর একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এবং কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে দিয়েই কাজটা করালেন।

'স্বপ্ন নিয়ে' ছবিটা সেই সময় হয়তো কিছু সম্মান পায়নি। কিন্তু ছবিটা তৈরির মধ্যে একটা অসাধারণ ভালবাসা ছিল, একনিষ্ঠতা ছিল, যার মর্যাদা অনেক বেশি। ছবিটা যখন রিলিজ করল এবং ছবিটা আশানুরূপ চলছে না, তখন একদিন পূর্ণেন্দুবাবু আমার কাছে ছুটে এলেন। বললেন, "ছবিটা চলছে না। কিন্তু চালাতে হবে"। আমি বললাম কিভাবে চালাবেন? যে ছবি চলছে না, তা কি করে চালানো যাবে?" তো উনি বললেন, "আপনি লিখে দিন যে, এই ছবি আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি।" আমি বললাম, "তাহলে আপনার ছবিটা চলবে কি?" আসলে আর্টিস্টদের মধ্যে একটা পাগলামি থাকে, একটা ছেলে মানুষি থাকে, আর ভালবাসাটা অন্ধ। তো আমি লিখে দিলাম, "আমার শ্রেষ্ঠ ছবি।" অবশ্য যদি দর্শকরা আসেন। এতে ফলাফল খুব একটা বিরাট কিছু হয়নি। হয়তো কিছু দর্শক টেনেছিল।

তবে ছবিটা নিয়ে পূর্ণেন্দুবাবুর নিজের মধ্যেও একটা অতৃপ্তি ছিল। যেটা সব বড় শিল্পীর মধ্যেই থাকে। একদিন আমার বাড়িতে এলেন। বললেন, "মাধবী, 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবিটা না, ঠিকমত হয়নি। ঠিকমত করতে পারিনি। আমাকে যদি আরেকবার সুযোগ দিত, তাহলে আমি আরেকবার করে দেখাতাম ছবিটা"।

তার পর বেশ কিছুদিন পূর্ণেন্দুবাবুর কোন দেখা নেই। ভ্যানিস! হঠাৎ একদিন এলেন। 'স্ত্রীর পত্র' করবেন। আমিও উৎসাহ দিলাম, "করুন"। তো তখন আমার প্রথম বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চা হবার পর পূর্ণেন্দুবাবু এসেছেন। এসে বললেন, "মাধবী, আপনি কবে

থেকে শ্যুটিং করতে পারবেন?" আমি বললাম, "পূর্ণেন্দুবাবু, আপনার তো এক্সপেরিয়েন্স আছে। মানে আপনার তো অনেকগুলো বাচ্চা, আর আমার এই প্রথম। তাহলে, আমি কবে থেকে শ্যুটিং করতে পারব সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন।" তখন পূর্ণেন্দুবাবু বললেন, "আপনি তাহলে কোনদিনই শ্যুটিং করতে পারবেন না।" আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "তার মানে!" উনি বললেন, "হ্যাঁ। এখন বাচ্চা ঘুমুচ্ছে, বাচ্চা খাচ্ছে না—এইটা হবে। এর পরে বাচ্চা ছুটবে, দৌড়বে, হামাগুড়ি দেবে—আপনিও ব্যস্ত থাকবেন, কোথায় গেল কোথায় গেল করে। এর পরে বাচ্চা স্কুলে যাবে তার জন্য চিন্তা, এর পরে বাচ্চার বিয়ে হবে তার জন্য চিন্তা, তার পরে বাচ্চার শ্বশুর বাড়িতে কি হল তার জন্য চিন্তা, তারপরে তার বাচ্চা হবে তার জন্য চিন্তা— সুতরাং আপনার আর ছবি করা হবে না।" তখন আমি বললাম, "দূর, আপনি এমন সব আজে-বাজে কথা বলেন! আমার ডাক্তারবাবু বলেছেন, তিন মাস পর আমি কাজকর্ম করতে পারব।" তখন পূর্ণেন্দুবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনার কিন্তু ঘোড়ায় চড়া আছে। সিকোয়েন্সটা আমি রাখব ঠিক করেছি।" আমি তো অবাক! বললাম, "স্ত্রীর পত্রে ঘোড়ায় চড়া আপনি কোত্থেকে বার করলেন?" পূর্ণেন্দুবাবু অসম্ভব গম্ভীরভাব করে বললেন, "সেটা তো আপনার জানার কথা নয়। আর রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন। সেখানে পূর্ণেন্দু পত্রীরও কিছু ভাববার জায়গা থাকবে। আমি সেটা ভেবেছি এবং আপনাকে ঘোড়ায় চড়তে হবে।" আমি তখন খুব মুশকিলে পড়লাম। তিন মাস পরেই ঘোড়ায় চড়াটা ঠিক হবে কিনা ভেবে।

যাইহোক, আমি তো খুব টেনশনে আছি। ঘোড়ায় চড়তে হবে বলে। তো কিছুদিন পরে পূর্ণেন্দুবাবু একটা এসরাজ নিয়ে এলেন। এবং সঙ্গে টিচার। বললেন, "ইনি এসরাজের টিচার। আপাততঃ এই এসরাজটাই শিখুন।" আমি এসরাজ শিখতে শুরু করলাম। ছবিও শুরু হল। আমি মাঝেমাঝেই জিজ্ঞেস করতাম, "পূর্ণেন্দুবাবু, ঘোড়ায় চড়াটা কোথায় আছে?" উনি বলতেন, "আছে, পরে হবে।" একদিন বললাম, "আপনার স্ক্রিপ্টে তো এটা নেই।" উনি বললেন, "ওটা স্ক্রিপ্টে র বাইরে আছে।"

মানে এটা কিন্তু একেবারেই রসিকতা। এই গুণগুলো পূর্ণেন্দুবাবুর ছিল।

যাইহোক, 'স্ত্রীর পত্র' করলাম। সে সময় আমরা অনেক তর্ক-বিতর্ক বা ঝগড়া, যাই বলুন না কেন, করেছি। যেমন, আমি বললাম, "এই যে অর্ধেক কথা বললেন, অর্ধেক বললেন না, এটা মানুষ কি করে বুঝবে?" উনি বললেন, "হ্যাঁ, বুঝে নেবে। আপনি ও নিয়ে ভাববেন না।" কিন্তু পরবর্তীকালে যখন প্রোজেকশন দেখলাম, সেখানে দেখি আমি যেটা বলেছি, পূর্ণেন্দুবাবু সেটা শুনেছেন। দর্শকের বয়স এবং চাহিদার কথা মনে রেখে যেসব খামতি সম্পর্কে আমি পূর্ণেন্দুবাবুকে বলেছিলাম তা তিনি মেনে নিয়েছেন।

এর মধ্যে একদিন অসিত চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা এবং আমি অসিতবাবুকে পূর্ণেন্দুবাবুর ছবিটা সম্পর্কে বললাম। অসিতবাবু ছবিটা নিলেন। দেখা গেল সত্যিসত্যিই ছবিটা ভাল হয়েছে। সকলের ভাল লেগেছে এবং আমিও তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

পুরস্কার পেয়েছিলাম, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে।

এর পর আবার দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে । ইতিমধ্যে আমার পারিবারিক কারণেই আমি হঠাৎ একদিন ঘোষণা করলাম যে, আমি আর ছবি করব না। তো পূর্ণেন্দুবাবুও এসে হাজির আমার বাড়িতে, জানতে চাইলেন, আমার এই অভিনয় না করার কথাটা **কতখানি সত্যি? আমি বললাম, যে, যা তিনি শুনেছেন তা সত্যি। আমি আর অভিনয় করব না। উনি বললেন, "সে কি।** আমি তো আপনাকে দিয়ে চতুরঙ্গ করাব ভেবেছি। আপনি এটা withdraw করুন।" এবং এটা সত্যি যে, আমি যে আজ আবার অভিনয় করছি তার পিছনে পূর্ণেন্দুবাবুর বিরাট অবদান রয়েছে। কারণ উনি আমাকে দিয়ে আমার কথা withdraw করিয়েছিলেন। অবশ্য তখনো 'চতুরঙ্গ'র কাজ শুরু হয়নি।

এর পর যেদিন উনি আবার আমার কাছে এলেন, সেদিন ওঁকে দেখেই মনে হচ্ছিল একটা দুঃখ বেদনাবোধ নিয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় উনি এসেছেন। উনি বললেন "প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী 'চতুরঙ্গ' করবেন এবং সেটা সুচিত্রা সেনকে নায়িকা রাখতে হবে। আমি কি করব বলুন তো!" বললাম, "আপনি সুচিত্রা সেনকে নিয়েই করবেন। মিসেস সেনকে নিয়ে ছবি করার সুযোগ পেয়েছেন আপনি, যা কেউ পায় না। আর, একথা কেউ বলতে আসে? আপনি কি পাগল!" উনি বললেন, "না, আমি যে আপনাকে নিয়ে ভেবেছি। আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।"

যাইহোক, চতুরঙ্গ-র কিছুটা শ্যুটিং হবার পর ছবিটা বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ণেন্দুবাবুর এটা দুর্ভাগ্য।

বইমেলাতে যাবারও একটা দুর্বলতা ছিল পূর্ণেন্দুবাবুর। বইমেলাতে একদিন দেখি বসে ছবি আঁকছেন। সেল করছেন। জিজ্ঞেস করলে বলেছেন, এটা করতে ভালোই লাগে। কিন্তু আমার কথা হল, সত্যি সত্যিই কি তাঁর ভাল লাগত? না কি প্রয়োজনেরও একটা দিক ছিল তাতে! এই জায়গাটা পূর্ণেন্দুবাবু হয়তো লুকিয়েছেন। আসলে তিনি যে মাপের শিল্পী ছিলেন, তাতে বিত্তবান মানুষের তাঁকে বলা উচিত ছিল যে, আপনি আপনার কাজ করে যান, টাকা বা আপনার সংসারের দিকটা আমরা দেখব। সেটা হয়নি। এটা বড় দুঃখ, বড় যন্ত্রণাদায়ক।

তারপর আবার এল মালঞ্চ প্রসঙ্গ। আমাকেও রাজী করালেন। আমি বললাম "আপনি কিভাবে ছবিটা করবেন?" উনি বললেন, "ভিক্ষে করে করব।"

পরে শুনেছি সত্যিই অনেকে সাহায্য করেছেন। পি. সি. সরকার যে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন এটাও আমি জানি। এবং আমরা যারা শিল্পী ছিলাম, তারা কর্ম ভিক্ষা দিয়েছি, অর্থাৎ আমরা একটা পয়সাও না নিয়ে ছবিটা করেছিলাম।

আমরা শ্যুটিং করতে গেলাম চন্দননগর। সেখানে আমার কথাতেই পয়সা না নিয়ে গ্লোব নার্শারী বাগান সাজিয়ে দিয়েছিল। এবং শ্যুটিং শুরু হল। কিন্তু প্রোডাকশনের

লোকজনদের খাওয়ানোর মতো পয়সা পূর্ণেন্দুবাবুর নেই। কি করা যায়? আমার বা রবি ঘোষের মত লোকজনদের কয়েকজনের খাওয়া দাওয়ার কোন সমস্যা ছিল না। বেশ যত্ন করেই একটা বাড়িতে আমাদের আপ্যায়ণ করা হয়েছিল। কিন্তু এতগুলো লোক না খেয়ে থাকবে, সঙ্গে পূর্ণেন্দুবাবু—এটা হতে পারে না! তখন ওখানকারই শান্তিদেবী নামে একজন আমাদের পুরো ইউনিটের খাওয়ার দায়িত্ব নিলেন।

সারাদিন শ্যুটিং করে আমি চলে যেতাম আমার মাসতুতো ভায়ের বাড়ি। পরের দিন সকালে এসে দেখতাম পূর্ণেন্দুবাবুর বিধ্বস্ত চেহারা। অর্থাৎ রাতে ভাল করে ঘুমুতেন না। হাঁপানির কষ্ট। কিন্তু যখন তিনি কাজ করেন, তখন কোথায় যেন এই কষ্ট উড়ে যেত। কাজের প্রতি তাঁর এত ভালবাসা ছিল। সেই হিসেবে তাঁকে কেউ সাহায্য করল না, এটাই আমার দুঃখ।

আরেকবার পূর্ণেন্দুবাবু এলেন। বললেন, "মাধবী, ভীষণ জরুরী কথা আছে।" কথা হল যে, উনি 'ক্ষীরের পুতুল' করবেন। আমি বললাম, "সে তো অনেক টাকার ব্যাপার!" এখন হলে না হয় চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি ছিল, ওখানে বলে দেওয়া যেত। কিন্তু...! শেষ পর্যন্ত বললাম, "ঠিক আছে, ভাবতে থাকুন, আমিও ভাবতে থাকি।" এটাই পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে আমার শেষ কথা। অবশ্য উনি হয়ত দূরদর্শনের জন্য 'ক্ষীরের পুতুল' করেওছিলেন। কিন্তু তেমন সাকসেসফুল হয়তো হয় নি।

দূরদর্শনে আমার ক্লোজ আপ ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। সেখানে পূর্ণেন্দুবাবুই দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

এখানে আরেকটি প্রসঙ্গে কিছু বলব। অনেকেরই ধারণা যে, পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে বোধহয় আমার একটা রোমান্টিক সম্পর্ক ছিল। হ্যাঁ, রোমান্টিক সম্পর্ক একটা ছিল আমাদের মধ্যে। তবে সে সম্পর্ক হল, একটা শিল্পীর রোমান্টিকতা এবং সাধারণ মানুষের রোমান্টিকতা যেমন আলাদা। শিল্পীর রোমান্টিকতা হল, এক শিল্পী আরেক শিল্পীকে ভালবাসে অর্থাৎ শিল্পীর শিল্পকে, শিল্প-কর্মকে ভালবাসা। এখানে আমিও পূর্ণেন্দুবাবুর শিল্পকর্মকে ভালবাসতাম এবং পূর্ণেন্দুবাবুও আমার শিল্পকর্মকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। মানব-মানবী হিসেবে আমাদের মধ্যে কোন স্থূল ভালবাসা ছিল না।

অনেকে বলে থাকেন, পূর্ণেন্দুবাবুর প্রেরণা হলাম আমি। এটা নিতান্তই রটনা। তবে একটা প্রসঙ্গ বলি। যখন স্ত্রীর পত্র ছবির জন্য শ্যুটিং করতে যাই পুরীতে তখন ঘটনাটি ঘটে। পূর্ণেন্দুবাবুকে বললাম, "চলুন মন্দিরে, পুজো দেব।" উনি তো এসব বিশ্বাস করেন না, তাই বলে উঠলেন, "না না, আমি যাব না।"

আমি বললাম, "যাবেন। এই জন্যই যাবেন, যে আপনি একজন শিল্পী বলে। ওখানে যেসব ভাস্কর্য আর স্থাপত্য আছে, সেগুলো আপনার দেখা প্রয়োজন। জগন্নাথ দেবের যে মূর্তিটা আছে, সে মূর্তিটা কেমন, কেন এমন মূর্তি, এসব তো আপনার জানা দরকার। আমার পুজো দিতে ভাল লাগে আমি পুজো দেব।" পুজো দিলাম। তারপর বললাম,

"চলুন একটু গম্ভীরাতে যাব।" গম্ভীরাতে গিয়ে আমি একটা জিনিস খুঁজছি। জিনিসটা হল, চৈতন্যদেবের ঘরে আমার দাদুর আঁকা একটা ছবি। দাদুর নাম, শীতল ব্যানার্জী। শীতল ব্যানার্জী যে আমার দাদু হন, সেটা শুনে উনি একেবারে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। বললেন, "জানেন, আমি জীবনে প্রথম যে ছবি আঁকি, মানে যে ছবি দেখে আঁকা-র প্রেরণা অনুভব করি তা ঐ ওঁর অদ্ভুত ধরণের আঁকা কৃষ্ণ দেখেই। ঐ ছবি দেখেই আমি প্রথম স্কেচ শুরু করি।" তাই মনে হয় বলতে পারি যে, পূর্ণেন্দুবাবুর প্রেরণাটা তাহলে আমি নই, আমার দাদু।

শেষেরও শেষ থাকে। তাই আবার মনে পড়ছে, পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়েছে টেলিফোনে। আমার "আত্মজা' ছবি শেষ করার পর এবং বোধহয় ওঁর মেয়ের বিয়ের সময়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "পূর্ণেন্দুবাবু, আপনার ছবি করতে ইচ্ছে করে না?" উনি বলেছিলেন, "না। কারণ প্রোডাকশনের লোকজনদের আমার খুব ভয় করে।"

আমি বলেছিলাম, "প্রোডাকশনের দিকটা যদি আমি দেখি?"

উনি বলেছিলেন, "ঠিক আছে, আপনি যদি থাকেন, তাহলে আমি আবার ছবি করব।"

এটাই পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে আমার শেষ কথা।

আমার মতে পূর্ণেন্দুবাবু একজন সাধক ছিলেন। সাধনাতেই তাঁর প্রাপ্তি, সৃষ্টিতেই তাঁর আনন্দ।

তপন কর সম্পাদিত 'পূর্ণেন্দু পত্রী এক বহুমুখী প্রতিভা' বইটি থেকে পুনর্মুদ্রিত।